গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ১১ জুলাই ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সমস্ত স্বৈরাচারী শাসকের মতো

সি পি এম-ও আন্দোলনকে বলছে বিশৃঙ্খলা

এস ইউ সি আই সমর্থিত বিদ্যুৎ বিল বয়কট আন্দোলনকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে 'কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে' বলে হুমকি দিয়েছেন সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস।

অনিল বিশ্বাস বলেছেন — "আন্দোলন এক জিনিস, আর আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা অন্য জিনিস। জবরদস্তি মূলক দরজায় তালা দেওয়া, শাটার নামিয়ে দেওয়া, এরকম কাজ করলে তা তো জনগণের বিরুদ্ধেই যাবে। আর সেক্ষেত্রে সরকারকে তো ব্যবস্থা নিতেই হবে।" (গণশক্তি ৩০-৬-০৩)। অনিলবাবু যা বলেছেন তা অসত্য শুধু নয়, আসলে তা সি-ই-এস-সি'র মালিক গোয়েঙ্কা এবং সরকার নির্দেশিত পুলিশ-প্রশাসনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে বর্তমানে তাঁরা এত ব্যগ্র যে, সরকারি তরফ থেকে নয়, দলের তরফ থেকেও আন্দোলনকে বিশৃঙ্খলা আখ্যা দিয়ে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিতে তাঁদের বাধছে না।

বিশৃঙ্খলা বলে চিহ্নিত করে সেই অজুহাতে পুলিশ-মিলিটারি দিয়ে আন্দোলন দমন করা নতুন কিছু নয়। এদেশে ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও অন্যান্য বুর্জোয়া দল যারাই আন্দোলন দমনের শক্তি হিসাবে কাজ করেছে, তারা সবসময়ই গণআন্দোলনকে অশান্তি সৃষ্টি বলেছে এবং জনগণের ক্ষোভকে আইনি বেড়াজালে বাঁধতে চেয়েছে। সর্বকালেই শাসক-শোষকরা চেয়েছে তাদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমনে জমে ওঠা ক্ষোভকে পোষ মানিয়ে তাদেরই কেটে দেওয়া আইনি খাতে সেই ক্ষোভ বইয়ে দিয়ে নিষ্ফলা করে দিতে। তাই পোষ মানা আন্দোলনে তাদের তত আপত্তি নেই। কিন্তু যদি আন্দোলন তাদের কেটে দেওয়া গণ্ডির বাইরে যায়, যদি শোষকশ্রেণীর বশংবদ দল ও নেতাদের হাতে আন্দোলনের লাগাম না থাকে, যদি আন্দোলন জনগণকে জাগায়, যদি সংগঠিত জনশক্তি গড়ে তোলার ও অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে — তাহলেই তারা আইনশৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে আন্দোলন দমন করে। বামপন্থী বচনের আড়ালে, লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে সি পি এমও আজ

মালিকশ্রেণীর স্বার্থে এই কাজটাই করছে।

রাজ্যের ক্ষমতায় বসে মালিকশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থ রক্ষাকেই তারা প্রধান কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছে বলেই, লাগামহীন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির বোঝা তারা গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের ওপর জেনে বুঝে চাপিয়ে দিচ্ছে। অনিলবাবু বলেছেন — "কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইনের বিরুদ্ধে আমরা গোড়া থেকেই আন্দোলন করছি।" কি আন্দোলন তাঁরা করেছেন? তিনি বলেছেন — দিল্লির পার্লামেন্টে তাঁরা আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় কম থাকায় বিল পাশ হয়ে যায়। যেন সংখ্যায় কম থাকায় বিল পাশ হয়ে যাবে তাঁরা তা বুঝতে পারেননি। এর নাম আন্দোলন? এসব কথার দ্বারা তারা কাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন? তারপর তিনি বলেছেন, "বিভিন্ন গণসংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা মানুষকে নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি" (গণশক্তি ৩০-৬-০৩)। কোথায় করছেন? বিল পাশ হয়ে গেল, তারপর তা কার্যকরীও হল। কোথায় তাঁদের আন্দোলন? যে মানুষকে নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁরা আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন বলে বলছেন, সেই মানুষই জানে না কোথায় সেই প্রস্তুতি তারা করছেন এবং কি সেই আন্দোলনের গণতান্ত্রিক কর্মসূচি?

বিদ্যুৎ বিল ২০০৩ সংসদে পেশ হওয়ার আগে তার বিরুদ্ধে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি'তে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা পর্যন্ত তাঁরা করেননি। এমনকি সংসদেও এ-প্রশ্নে সমস্ত বিরোধী দলকে একজোট করা, বাইরের আন্দোলনের চাপে সংসদীয় দলগুলিকে এই বিলের বিরোধিতা করতে বাধ্য করা প্রভৃতি চেষ্টাও তাঁরা করেননি। যা তাঁরা করেছেন তাহল, সংসদের ভেতর আইনমাফিক আনুষ্ঠানিক বিরোধিতা, এটা জেনেই যে, সেই বিরোধিতার ফলে এই বিল

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্যনীতি দিয়ে বোঝা যায় একটা সরকার কতটা দায়িত্বশীল

চিকিৎসকদের বিক্ষোভ সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

৫ জুলাই কলকাতায় আই এম এ'র উদ্যোগে আহূত এক বিক্ষোভ সভায় এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

মুর্শিদাবাদে শিশুদের মর্মান্তিক মৃত্যু ও তারপর সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ চিকিৎসকরা এদিন প্রথমে কলকাতা মেডিকেল কলেজে একটি কনভেনশনে মিলিত হন, তারপর মিছিল করে রাণী রাসমণি রোডে যান। কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ অসীম রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে ডাঃ চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নির্মল মাজি, ডাঃ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিজয় বিশ্বাস ও ডাঃ এ গোস্বামীরা রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেন। আই এম এ'র এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন মেডিকেল সার্ভিস

সেন্টার, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির মত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরাও।

রাজ্যপালকে দেওয়া স্মারকলিপিতে চিকিৎসকরা বলেছেন, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে কিছুই নেই, সাবডিভিশনাল হাসপাতালগুলিতে জ্বরের ওষুধ প্যারাসিটামলও থাকেনা, অক্সিজেন পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় ডাক্তারদের পক্ষে চিকিৎসা করা অসম্ভব, অথচ সরকার রুগীদের মৃত্যুর জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারদের উপর সব দায় চাপিয়ে দিচ্ছে, বিনা বিচারে তাদের শাস্তি দিচ্ছে। রাজ্যপালের সাথে আলোচনায় চিকিৎসকরা তাঁকে বলেছেন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যপরিষেবার কোনও উন্নতি না ঘটিয়ে এভাবে ডাক্তারদের বলির পাঁঠা করা হলে তাঁরা রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হবেন।

রাণী রাসমণি রোডের বিক্ষোভসভায় আই এম এ কর্তৃক আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, চিকিৎসকদের এই আন্দোলন ও কর্মসূচিতে সমর্থন জানিয়ে বলেন, জনগণের প্রতি একটা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ আছে কিনা, তা

আটের পাতায় দেখুন

অন্য পাতায়

- বন্ধ-ধর্মঘট কেন ?
- শিশুমৃত্যু তদন্ত রিপোর্ট
- আই এল ও সম্মেলনে ইউ টি ইউ সি-এল এস
- বিদেশ সংবাদ

২৯ জুলাই রাজ্যব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিল ডি এস ও

দেশের শিক্ষাজগৎ আজ সর্বাত্মক আক্রমণের মুখোমুখি। একদিকে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যকরণের ধাক্কায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর পরিমাণে ফি বাড়ছে, চালু হয়েছে ডোনেশন, গজিয়ে উঠছে নিত্যনতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান — যেখানে শিক্ষাকে বিক্রি করা হচ্ছে চড়া দামে; সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ ক্রমাগত সঙ্কুচিত হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে, অন্যদিকে শিক্ষার বিষয়বস্তুতে আনা হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিক্ষার সিলেবাস ও পঠন-পাঠন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যতটুকু বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা গড়ে ওঠার সুযোগ রয়েছে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে শিক্ষাক্রমের মধ্যে ধর্মীয় অন্ধতা ও কুসংস্কারকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, জ্যোতিষশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র, পৌরোহিত্য ও গুপ্তবিদ্যার মতো বিজ্ঞানবিরোধী বিষয়কে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে, ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের মনে ধর্মীয় অন্ধতার অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। তারই পাশাপাশি শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কিছু প্রযুক্তিগত শিক্ষা দিয়ে তাকেই বিজ্ঞানশিক্ষা বলে চালানো হচ্ছে। এইভাবে যে মুষ্টিমেয়

পাঁচের পাতায় দেখুন

‘চাকরি ও শিল্প সম্পর্ক’ বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম দপ্তরের অধীন ভি ভি গিরি ন্যাশানাল লেবার ইনস্টিটিউট গত ২৩ ও ২৪ জুন বিদ্যুৎ ও টেলিকম ক্ষেত্রে ‘চাকরি ও শিল্প সম্পর্ক’ বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্যতম সম্পাদক কমরেড সুনীল মুখার্জী এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আলোচনা করে দেখান যে, বিদ্যুৎ শিল্পে সংস্কার ও পুনর্গঠনের নামে দীর্ঘ বৎসরের শ্রম ও প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা পরিকাঠামোকে আজ তছনছ করে দেওয়া হচ্ছে। ওড়িশার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ভয়াবহ অবস্থা এমনকি সরকারও মানতে বাধ্য হয়েছে। অন্ধ্র সহ কয়েকটি রাজ্যের চিত্র অনুরূপ। সংস্কারের নামে ব্যাপক কর্মী সংকোচনের ফলে বিদ্যুৎ শিল্পের শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা থাকছে না, থাকবে না দীর্ঘদিনের অর্জিত অধিকার। সর্বোপরি রেগুলেটরি অথরিটির দ্বারা ক্রমাগত বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র ও মধ্য আয়ের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর অর্থনৈতিক বোঝার খড়্গ নেমে এসেছে। এই দুর্বিষহ অবস্থায় বাঁচার পথ তথাকথিত ‘সংস্কার’ থেকে সরে আসা।

শিক্ষাবিদ, কারিগরি কর্মকর্তা এমনকি বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমঅধিকর্তারাও শিল্পে ও শ্রমিকদের জীবনে ‘সংস্কার’এর ফলে যে আঘাত নেমে এসেছে তা সেমিনারে তুলে ধরেন। বিশেষ করে ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিকদের ভয়াবহ অবস্থার কথাও তাঁরা তুলে ধরেন — যেখানে মজুরির কোন নির্দিষ্ট মান নেই, চাকরির কোন স্থায়িত্ব নেই এবং এই অবস্থায় তাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই।

জলপাইগুড়ি

গ্রামীণ গরিবদের বাঁচার দাবিতে আন্দোলন

গত ৩০ জুন জলপাইগুড়ি সদর বিডিও এবং বি এল এল আর ও-কে এস ইউ সি আই দলের সদর ব্লক কমিটির উদ্যোগে এক দাবিপত্র পেশ

করা হয়। দাবিপত্রে উল্লেখ করা হয় ঃ (১) অবিলম্বে ভারতীয় সমস্ত নাগরিককে বিনা হয়রানিতে রেশন কার্ড দিতে হবে, (২) দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী সমস্ত নাগরিককে বি পি এল আওতায় নথিভুক্ত করতে হবে, (৩) সরকারি তদন্তকারী অফিসারকে প্রতিটি গ্রামে তদন্ত করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বি পি এল কার্ড সরবরাহ করতে হবে, (৪) সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে বাসবাসকারী সমস্ত নাগরিককে তদন্ত সাপেক্ষে পরিচয়পত্র দিতে হবে, (৫) সেচ কর নেওয়া চলবে না, (৬) সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে পাট কেনার জন্য জে সি আই-কে হাটে হাটে ন্যায্যমূল্যে পাট ক্রয় কেন্দ্র খুলতে হবে, (৭) ৬ একরের নীচে খাজনা মকুব করতে হবে, (৮) অবিলম্বে খাজনা মকুবের সার্টিফিকেট দিতে হবে, (৯) মকুবের সার্টিফিকেট না দেওয়া পর্যন্ত খাজনা আদায় করা চলবে না, (১০) জমির নাম জারির বা পাট্টা দেওয়ার নামে যখন তখন নিয়ম বহির্ভূত টাকা আদায় করা চলবে না। দাবিপত্র পেশ করার আগে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। এছাড়াও সদর ব্লক অফিস এবং বি এল এল আর অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। উক্ত বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কে কে এম এস-এর জেলা সম্পাদক কমরেড হরিভক্ত সর্দার, পার্টির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বিনয় বোস। এছাড়াও কমরেড জীবন সরকার ও রবি রায় বক্তব্য রাখেন।

উত্তর ২৪ পরগণা

আন্দোলনের চাপে খাজনা ফেরত

সর্বনাশা খাজনা নীতি প্রত্যাহারের দাবিতে ও অন্যায়ভাবে খাজনা আদায়ের প্রতিবাদে গত ১৭ জুন কে কে এম এস-এর পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া ব্লকের যদুরহাটি (উঃ) অঞ্চলের আর আই অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। শতাধিক চাষি এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনের চাপে আর আই অন্যায়ভাবে খাজনা আদায়ের কথা স্বীকার করেন এবং এই অঞ্চলের জঙ্গলপুর গ্রামের চাষি বলাইচন্দ্র কর্মকারের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে আদায়ীকৃত বাড়তি ৫০২টা খাজনা ফেরত দিতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় এলাকার চাষিদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এরপর আর আই অফিসের সামনে ৫ শতাধিক মানুষ সমাবেত হয়। আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য গণকমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার আহবান জানিয়ে এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড নুরুল আলম।

মেদিনীপুর

স্কুলে ভর্তি ফি ৫০০ টাকা কমলো

মেদিনীপুর নারায়ণ বিদ্যাভবন স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি ফি ৩৫০ টাকা এবং ডোনেশান ৫০০ টাকা, মোট ৮৫০ টাকা নেওয়ার কথা ঘোষণা করলে ডি এস ও মেদিনীপুর শহর কমিটির পক্ষ থেকে আন্দোলন শুরু হয়। ভর্তির কাউন্টার বন্ধ করে দেওয়া, ছাত্র-অভিভাবকদের নিয়ে কাউন্টারে বিক্ষোভ-অবস্থান ইত্যাদি কর্মসূচি পালিত হয়। শেষ পর্যন্ত ডোনেশান ছাড়াই স্কুল কর্তৃপক্ষ ডি এস ও কর্মীদের উপস্থিতিতে ছাত্রদের ভর্তি করতে বাধ্য হয়।

ডি এস ও’র পক্ষ থেকে অন্যান্য স্কুলেও আন্দোলন চলছে। এলাকায় এলাকায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের নিয়ে সেভ এডুকেশন কমিটি গড়ে তোলা হচ্ছে। আন্দোলনের চাপে ডি আই পশ্চিম মেদিনীপুরে স্কুলগুলোতে বাড়তি ফি-ও ডোনেশন না নেওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠাতে বাধ্য হয়েছে (Memo no 228-S, তাং ১৪ জুন, ২০০৩)। ডি আই-এর নির্দেশ যাতে স্কুলগুলো কার্যকরী করে তার জন্য আগামী ৪ঠা জুলাই পশ্চিম মেদিনীপুরে কাঁথিতে এ ডি আই-এর কাছে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর হুমকির প্রতিবাদে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী’র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা মুখ্যমন্ত্রীর ঘেরাও সম্পর্কিত বক্তব্য প্রসঙ্গে গত ৪ জুন নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন। ঃ

“মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করার জন্য সমস্তরকম গণআন্দোলনকে বেআইনি ঘোষণা করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। মার্কসবাদের তকমা এঁটে তিনি আজ চন্দ্রবাবু নাইডু, জয়ললিতা ও অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে নগ্নভাবে ব্যবহার করছেন পুঁজিপতিদের আস্থা অর্জন করার লক্ষ্যে।

পশ্চিমবাংলায় সরকারি নথিভুক্ত বেকার ৬০ লক্ষেরও বেশি। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ চলছে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে। পি এফ এবং ই এস আইয়ের টাকা বকেয়াতে বুদ্ধবাবুর রাজ্য দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে। ক্লোজার, লে-অফ ও লক-আউট ঘোষণা করে মালিকরা লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছে। অসংগঠিত শ্রমিকদের সারা বৎসর কাজ নেই এবং সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি থেকে তারা বঞ্চিত। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পরিবহন প্রভৃতি পরিষেবার অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে যাতে কোনও আন্দোলন গড়ে না ওঠে সেজন্য মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, ঘেরাও প্রভৃতিকে বে-আইনি ঘোষণা করে তিনি পশ্চিমবঙ্গকে মালিকদের লুঠের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করতে চাইছেন।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রয়াত রাজ্য সভাপতি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী ঘোষিত “ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ চলবে না” নীতির ফলে সেইসময় পশ্চিমবাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল দমন পীড়ন থেকে মুক্ত সত্যিকারের গণআন্দোলনের যথার্থ পরিবেশ। এই নীতির সুযোগ নিয়েছিল যে সমস্ত স্বার্থান্বেষী মহল তাদের তাৎক্ষণিক সুবিধার জন্য, তারাই আজ ক্ষমতায় বসে এই নীতির বিরোধিতা করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই মালিক তোষণ ও শ্রমিকদমন নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিক্ষোভ জানাতে আগামী ২৫ জুলাই রানি রাসমণি এভিনিউয়ে সামিল হবে ২৫ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী।”

বর্ধমান

সালানপুরে বিল বয়কট

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, সিকিউরিটি চার্জবৃদ্ধি ও অভিন্ন মাশুল নীতি চালু করার প্রতিবাদে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে সাড়া দিয়ে বর্ধমান জেলার সালানপুর ব্লকের গ্রাহকরা ২০ জুন থেকে ব্যাপকহারে বিল বয়কট আন্দোলনে সামিল হয়ে অনেকেই বিদ্যুৎ অফিসের সামনে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে পিকেটিং-এ অংশ নেন এবং আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিজেদের নাম লেখান। সি পি এম নেতৃত্ব আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও ঐ দলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশ এই বয়কটে অংশ নেন। ইলেকট্রিক অফিসের আশেপাশের দোকানদাররা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

কোচবিহার

জেলাজুড়ে বিক্ষোভ-অবরোধ

সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের খাজনানীতি, বিদ্যুতের চার্জবৃদ্ধি এবং বাসভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে মাথাভাঙার বাস টার্মিনাসের সামনে গত ৩০ জুন পথ অবরোধ করা হয়। অবরোধচলাকালীন পুলিশ এসে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিচার্জ করে, কমরেড মানিক বর্মণ ও সাগর চৌধুরীসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়। পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে উপস্থিত স্থানীয় জনসাধারণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানান।

এই একই দাবিতে ঐদিন কোচ-বিহারের দিনহাটা, তুফানগঞ্জ শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়।

হলদিবাড়ি বন্‌ধে পুলিশি অত্যাচার

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি ব্লকে ছাত্রভর্তি সমস্যা এবং উচ্চহারে ডোনেশান আদায়ের প্রতিবাদে ২৫ জুনের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ছাত্র-অভিভাবকদের উপর পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে ২৬ জুন হলদিবাড়ি বন্‌ধ পালিত হয়। বন্‌ধের দিন শিক্ষক গ্রেপ্তার, ছাত্রী নিগ্রহ ও গ্রেপ্তার, লকআপে অত্যাচার করার প্রতিবাদে মিথ্যা মামলা দায়ের করার প্রতিবাদে গত ৩০ জুন একটি বিশাল মিছিল হলদিবাড়ির বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এবং বাসস্ট্যান্ডে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আন্দোলন-বন্‌ধ নয়, পুঁজিবাদই সঙ্কটের জন্য দায়ী

বেশ কিছুদিন যাবৎ সংবাদপত্রে ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে, যেকোনরকম আন্দোলন বিশেষত সাধারণ ধর্মঘট বা বন্‌ধ-এর বিরুদ্ধে একটা প্রচার পরিকল্পিতভাবে তোলা হচ্ছে। এদের প্রচারের মধ্যে ভাষার যা-ই তারতম্য থাকুক না কেন, প্রচারের মূল সুরটি সর্বত্রই এক। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, সাধারণভাবে যেকোন ধরনের আন্দোলন বিশেষত বন্‌ধ বা ধর্মঘট করে কোন লাভ হয় না ; এই বন্‌ধ বা ধর্মঘট অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে আনে। এসব কথার সারবত্তা কতটুকু, বা আদৌ কোন সারবত্তা আছে কিনা, তথ্য ও যুক্তির নিরিখে তা বিচার করে দেখা যাক।

ইদানীং বন্‌ধের বিরুদ্ধে তাঁরা বলছেন — "আজকাল ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কে ধর্মঘট করলে মাইনে কাটা যায়, ধর্মঘটীদের কাছে কর্তৃপক্ষের কড়া চিঠি আসে। তাই কর্মীরা মোটেই নিখরচায় বন্‌ধ উদ্‌যাপন করেন না। কলকারখানা বা অন্য বেসরকারি সংস্থাগুলিতে একই নিয়ম। অর্থাৎ সেখানেও বন্‌ধ মানে একদিনের মাইনে বন্ধ। যদি উপায় থাকত এসব সংস্থার ক'জন কর্মী গাঁটের কড়ি খরচ করে বন্‌ধ পালন করতেন সন্দেহ আছে।" (বর্তমান পত্রিকায় অভিরূপ সরকারের নিবন্ধ, ২৭.৫.০৩)

এরপরেই এক ধাপ এগিয়ে ঐ নিবন্ধেই তিনি বলেছেন, "এসব তো বাঁধা মাইনের চাকুরেদের কথা। এর বাইরে অসংখ্য লোক আছে যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে দিন আনে দিন খায়। তাদের কাছে এক-একটা বন্‌ধ, এক একটা অভিশাপ।" আবার ২১ মে শিল্প ধর্মঘটকে উপলক্ষ্য করে ২৪ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় অভিজিৎ ঘোষাল লিখেছেন, "শিল্প ধর্মঘটের মুখোশ পরে বন্‌ধ যে উগ্র চেহারা নিয়ে এসেছে, শিল্পায়নের জন্য রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা শিল্প তাতে আতঙ্কিত।"

আবার কেউ কেউ মনে করেন, বন্‌ধের মাধ্যমে আসলে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্কৃতিহীন মানুষ ছুটি উপভোগ করেন। এ ব্যাপারে আনন্দবাজার পত্রিকার ২৩ মে'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে— "পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্কৃতি এমনই জায়গায় পৌঁছাইয়াছে যে রাজ্য রাজনীতিতে প্রান্তিক (পড়ুন এস ইউ সি), এমনকী অর্বাচীন কোন শক্তি ধর্মঘট বা বন্‌ধ ডাকিলেও তাহা সর্বাত্মক সফল হইয়া যায়।"

সুতরাং এদের মতে বন্‌ধ সর্বাত্মক রূপে ক্ষতিকারক। এর দ্বারা এ রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের কাছে ভুল সঙ্কেত যাবে, ফলে তাঁরা এ রাজ্যে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকবেন। পরিণামে রাজ্যের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তো সাধারণ মানুষেরই ক্ষতি। তাঁরা চাকরি পাবেন না, তাঁদের আয় কমে যাবে। তাই আর্থিক উন্নয়নের রথের চাকাকে যদি নিরন্তর ধাবমান রাখতে হয় তাহলে অবিলম্বে সমস্ত রকম স্ট্রাইক, বন্‌ধ বা যেকোন ধরনের জঙ্গি আন্দোলন অবশ্য পরিত্যাজ্য।

ধর্মঘট বা আন্দোলন, নাকি অর্থনৈতিক সঙ্কট —উন্নয়ন আটকাচ্ছে কে ?

এতো গেল সংবাদমাধ্যম বা দেশের স্বঘোষিত তথাকথিত অভিভাবকদের উচ্চকিত ঘোষণা। কিন্তু বাস্তব কি বলে? সত্যই কি সাধারণ ধর্মঘট, স্ট্রাইক বা যেকোন ধরনের জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী? বিগত পাঁচ বছরে বিভিন্ন শিল্পে যেসব কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, দেখা যাক তার জন্য শ্রমিক আন্দোলন কতটা দায়ী? ১৯৯৫ সালে বিভিন্ন কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার হিসাবটি এরকম ঃ ঐবছর মোট ১৬৯টি শিল্প বন্ধ হয়। এর মধ্যে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে বন্ধ হয় মাত্র ৩৩টি এবং লক-আউট এর কারণে ১৩৬টি। সরকারি হিসাব অনুযায়ী শ্রমিকদের স্ট্রাইকের ফলে ঐ বছর ১০ লক্ষ ২৫ হাজার শ্রমদিবস নষ্ট হয়। অথচ মালিকদের লক আউটের ফলে নষ্ট হয়েছে ৫০ লক্ষ ২৫ হাজার শ্রমদিবস। এরকম বাকি ছয় বছরের হিসাব নিচের সারণীতে দেওয়া হল।

সাল	স্ট্রাইক	শ্রমদিবস নষ্ট ১০ লক্ষ হিসাবে	লকআউট	শ্রমদিবস নষ্ট ১০ লক্ষ হিসাবে
১৯৯৬	১৭	১.৬৭	১৩৬	৫.২৫
১৯৯৭	২৯	০.৬২	১৪৪	১০.৪৭
১৯৯৮	২৫	০.২২	২১৩	১৭.৭৭
১৯৯৯	৩৪	৩.৯০	২১৮	২১.৬৭
২০০০	২৭	৩.২১	২৮৬	১৬.০৬
২০০১	২০	১.৩৭	৩০৫	১৯.৮০

(সূত্র ঃ লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল)

এই পরিসংখ্যান থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে আসে ঃ (১) পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে ক্রমেই সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে এবং তার একটা বড় কারণ হল ক্রমাগত বেশি বেশি শ্রমদিবস নষ্ট হওয়া। (২) এই শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার জন্য প্রধানত দায়ী মালিকদের পক্ষ থেকে করা লক আউট। (৩) শিল্পে ধর্মঘট ক্রমশ কমছে। অর্থাৎ জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বাড়ছে তো না-ই, বরং তা ক্রমশ কমে আসছে। (৪) সরকারি পরিসংখ্যান থেকেই আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। কিছু শিল্পে যেমন সূতা শিল্পে (cotton industry) ১৯৯৭ সালে একটিমাত্র ক্ষেত্রে স্ট্রাইক হয়েছিল। তারপর এ পর্যন্ত এই শিল্পে একেবারেই কোন স্ট্রাইক বা ধর্মঘট হয়নি। অথচ মালিকদের করা লক আউটের ফলে এ শিল্পে লাগাতার শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে। এই শিল্পে লক আউটের সংখ্যা ১৯৯৭ থেকে ২০০১ এই পাঁচ বছরে যথাক্রমে ৭, ১৪, ১৩, ১১, ১৭টি। সংবাদমাধ্যমের বুদ্ধিজীবীরা এ সত্ত্বেও বলবেন, আন্দোলন ও বন্‌ধ করেই দেশটা রসাতলে গেল ?

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন পুঁজিপতি বা মালিকরা লক আউট করে কারখানা বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের জীবনে আর্থিক বিপর্যয় ডেকে আনছে। এর কিছুটা উত্তর পরিসংখ্যানই দিচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, ২০০১ সালে ১৬৭টি কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শ্রমিক অশান্তির জন্য নয়, লক আউটের জন্য। কেন লক আউট? সরকারি ভাষায় বলা হয়েছিল, "Uneconomic running, technological obsolescence, loss of economic viability, managements' intention to reduce working complements"। সোজা কথায় এর অর্থ, মুনাফার পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে মালিকরা কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে।

সত্যিই তো! শ্রমিকরা কম মজুরি, অর্ধেক মজুরি (লে-অফ), বা কর্মহীন অবস্থায় কাটাতে পারেন, না খেয়ে মরতে পারেন, আত্মহত্যা করতে পারেন; কিন্তু মালিকরা তা বলে কষ্ট করবেন কেন? অতএব লক আউট চলবে, ছাঁটাই চলবে। এভাবেই দেশের 'আর্থিক উন্নয়ন' হবে। কিন্তু এর প্রতিবাদে আন্দোলন করলেই তাঁরা বলবেন 'কর্মসংস্কৃতি' নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কেন শিল্পের এই দুরবস্থা তার প্রকৃত কারণ কি, তা এঁরা বলছেন না। কেন্দ্রে অটলবিহারী বাজপেয়ী থেকে এ রাজ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সকলেই এদেশে নতুন শিল্পায়নের খোয়াব ফেরি করছেন। তাঁদের কথায়-বক্তৃতায় মনে হয় শিল্পায়ন জুড়িগাড়ি চড়ে আসছে। তবু কেন শিল্পায়নের এই ধূসর পাণ্ডুলিপি ?

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শিল্পে মন্দা বা আর্থিক সঙ্কট একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

একটা কথা এদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী স্বীকার করতে চান না যে, শিল্পায়ন বা আর্থিক উন্নয়ন অবশ্যই একটা অর্থনৈতিক নিয়ম মেনে চলে। এঁরা মনে করেন, কলকারখানা গড়ে উঠলেই দেশে কর্মসংস্থান হবে, তার জন্য চাই বিনিয়োগ। তাই বিনিয়োগ করার জন্য যেমনভাবে হোক ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়াও এঁরা মনে করেন, যাঁরা বিনিয়োগ করবেন তাঁরা তো শান্তিতে ব্যবসা করতে চাইবেন। নাহলে তাঁরা বিনিয়োগ করবেন কেন? অতএব শিল্পে কোন অশান্তি অর্থাৎ কোন আন্দোলন চলবে না। এটা সকলকে মেনে নিতে হবে। আর সকলে অর্থাৎ শ্রমিক বা জনগণ যাতে এটা মেনে চলেন সেটা দেখাই সরকারের কর্তব্য। সুতরাং, সরকার যেকোন মূল্যে আন্দোলন দমন করবে। দক্ষিণপন্থীদের কথা বাদ দিলেও ইদানীং মহাবাম(!) মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুও তাই বলছেন।

আমরা সরকারি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আগেই দেখিয়েছি যে শ্রমিক অশান্তির কারণে নয়, মালিকরাই বেশিরভাগ কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। কিন্তু কেন তাঁরা এটা করছেন? বহুদিন আগে মার্কস তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণের দ্বারা এটা প্রমাণ করেছিলেন যে, পুঁজিপতিরা যে হারে পণ্য উৎপাদন করে, সেই হারে পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে পারে না (The bourgeois system is no longer able to cope with the abundance of the wealth it creates)। তিনি আরও দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদ ক্রমাগত উৎপাদনের প্রকৌশল ও যন্ত্রপাতিকে উন্নত থেকে উন্নততর করে চলে, যার ফলে সৃষ্টি হয় একদল বেকারবাহিনী (army of unemployed)। এর জন্য উৎপাদিত পণ্যের বাজার আরও সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সুতরাং বেশি উৎপাদন, বাড়তি উৎপাদন পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান সঙ্কট হয়ে দাঁড়ায়। একথা সেদিন যেমন সত্য ছিল, কালের পরিক্রমায় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উন্নীত হওয়ায় এসত্য আরও প্রকট হয়েছে, এর পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে।

ইতিপূর্বে দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গিয়েছে, যা ছিল আসলে পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজার দখল নিয়ে যুদ্ধ। বর্তমানে, বিশেষ করে বিশ্বায়নের পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই বাড়তি উৎপাদনের সঙ্কট এক সর্বব্যাপক ধ্বংসাত্মক রূপ নিয়েছে। কেবলমাত্র উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিই নয়, অনুন্নত বা ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিরও প্রধান সমস্যা বাড়তি উৎপাদনজনিত সঙ্কট। কিন্তু নিশ্চয় এর মানে এই নয় যে, দেশে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার মানুষের চাহিদা মিটিয়েও এত বেশি হয়ে গিয়েছে যে, তার বিক্রির বাজার নেই। বুর্জোয়া অর্থনীতিতে চাহিদার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা হল কেনার ইচ্ছা এবং ক্রয়ক্ষমতা দুইয়ের সম্মিলন। অর্থাৎ প্রয়োজন থাকলেও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে চাহিদা থাকছে না। আর চাহিদা না থাকলে বাজার নেই, বা পণ্যের বিক্রি হবে না। এ প্রসঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে কেন্দ্র করে যে কল্পনার মোহজাল সৃষ্টি করা হচ্ছে, সে সম্পর্কেও বলে যাওয়া দরকার। তা হল মূল শিল্পকে ভিত্তি করেই তথ্যপ্রযুক্তি বা পরিষেবা শিল্প গড়ে ওঠে। এজন্য এদের বলা হয় অনুসারী শিল্প (ancillary industry)। ফলে মূল শিল্প সঙ্কটগ্রস্ত হবে, আর তার অনুসারী তথ্যপ্রযুক্তি বা পরিষেবা শিল্প দ্রুত বেড়ে চলবে — এ ধরনের স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন বা দেখাচ্ছেন, তাঁরা হয় মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন, না হয় জেনেশুনে মানুষকে ঠকাচ্ছেন।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিই ক্রমাগত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, স্বাধীনতার পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করার পরও এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে ঠেকেছে কেন? এত শিল্প গড়ে ওঠা ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সত্ত্বেও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই কেন? এ ব্যাপারেও কয়েকটি চমকপ্রদ পরিসংখ্যান রয়েছে। যেমন আমাদের দেশে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে, অর্থাৎ যেখানে শ্রমিকদের মজুরি মোটামুটি ভাল তাতে কাজ করেন দেশের মাত্র ৯% মানুষ। আর অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন ৯১% মানুষ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষদের আয় কেমন? এর মধ্যে কৃষি মজুরদের জন্য নির্ধারিত দিনমজুরি হচ্ছে ৬২.১০ টাকা (খাদ্য বাদে)। মনে রাখতে হবে, সরকারি হিসাবেই এদের ১০০ দিনের বেশি কাজ থাকে না এবং সরকার নির্ধারিত মজুরিও বহুক্ষেত্রে তারা পায় না। তার চেয়ে অনেক কম পায়।

এরপরে প্রথমেই আসে প্রেস কর্মচারীরা যাদের মাসিক বেতন (ডি এ সমেত) ১২০৯ টাকা। এরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে সবচেয়ে নীচে আছেন। সবার উপরে আছেন মোটরযানের কর্মচারীরা যাঁদের মাসিক বেতন ২৪০১.৪০ টাকা। আর এই দুই মেরুর মাঝখানে আছেন বেকারী, ইটভাটা, চালকল, চাকীমিল, পাথর ভাঙা, কাগজকল, করাতকল, জুতো তৈরির কারখানা, প্লাস্টিক কারখানা, বিড়ি শিল্প প্রভৃতি অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৯১% মানুষ — যাদের আয় ২৪০১ টাকার চেয়ে কম। (সূত্র ঃ লেবার ইন

চারের পাতায় দেখুন

শ্রমিক বন্‌ধ বা ধর্মঘট করে কেন ?

তিনের পাতার পর

ওয়েস্ট বেঙ্গল, ২০০১)

আমরা ধরে নিতে পারি, এদের পরিবারে গড়ে ৪/৫ জন সদস্য আছেন। এর সাথে রয়েছে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো ৬১ লক্ষ ৮০ হাজার ৮০০ বেকার (সারা দেশে কত কোটি তার হিসাব নেই), যাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই বললেই চলে। এ অবস্থায় তাঁরা কী ভোগ্যপণ্য কিনবেন? তাঁদের তো নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খাদ্যবস্তুর দাম, বাড়িভাড়া, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, সন্তানদের পড়াশুনা, পরিবারের সকলের চিকিৎসার খরচ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হল, গোটা দেশের তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষ পেশার ক্ষেত্রে যে ধরনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকেন ও যে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কাজ করেন তা এককথায় অবর্ণনীয়। ঘরে একটি মাত্র বাতি ও একটি দরজা — এ হল বেশিরভাগ চটকলের শ্রমিকদের বাসস্থান। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে জীবন বিপন্ন করে তাদের রুটিরুজির সংস্থান করতে হয়। বিগত ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পগুলিতে ৩৪,৭৪৭টি দুর্ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে গুরুতর বা প্রাণহানি - অঙ্গহানির ঘটনা ৫৭টি। এর মধ্যে চটকলের দুর্ঘটনা সর্বাধিক (১৩০৬০টি)। (সূত্র ঐ)

এইভাবে মনুষ্যেতর প্রাণীর মত বেঁচে থাকার জন্য মালিকদের চাপিয়ে দেওয়া বিপুল উৎপাদনের কোটা পূরণ করতে গিয়ে এক একজন শ্রমিক যখন তিল তিল করে পুঁজিবাদের শোষণের যন্ত্রে উজাড় করে দিচ্ছেন তাঁর জীবনের যা কিছু সুন্দর — তাঁর স্বাস্থ্য, মেধা, যাবতীয় অনুভূতি, ঠিক তখনই কোন এক মুহূর্তে মালিকরা 'লাভ ঠিকমত হচ্ছেনা' বলে, হয় তাদের ছাঁটাই করছে, বসিয়ে দিচ্ছে, নয়ত পুরো মিল লক আউট করে দিচ্ছে, বা আইন বাঁচিয়ে সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিশ রাতারাতি ঝুলিয়ে দিচ্ছে। তাতে কিন্তু সরকারি মত অনুযায়ী শিল্পায়নের ব্যাঘাত হচ্ছে না। শিল্পায়নের রথ টানবে যারা সেই শ্রমিক আজ বর্জ্য পদার্থে পরিণত হচ্ছে। আজ যে বাজার নেই, চাহিদা নেই, তার জন্য তো শ্রমিকরা দায়ী নন। তার জন্য দায়ী পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় উৎপাদন যত বাড়ে ততই মানুষ কাজ খুইয়ে বাড়তি হয়ে যায়, ততই চাহিদা কমে বাজার সঙ্কট আরও তীব্র হয়। তাই এ অবস্থায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে-যাওয়া শ্রমজীবী মানুষ কী করবেন ? তারা কি এভাবেই মুনাফার পাহাড় গড়ে দিয়ে সমাজের বর্জ্য পদার্থ হওয়ার অবস্থাটি মেনে নেবেন? পড়ে পড়ে মার খাবেন? না প্রতিবাদ কর-বেন? এসব প্রশ্নে বুর্জোয়া মুখপত্রের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা কি বলেন?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লড়াই ছাড়া পথ নেই

একজন শ্রমিক বন্‌ধ বা ধর্মঘট করে কেন? এটা কি তার শখ? সে জানে একদিন কাজ না করলে তার একদিনের রুজি বন্ধ হয়। সেখানে তাকে তখনই ধর্মঘট করতে হয়, আন্দোলন করতে হয় যখন তার উপায় থাকে না। যাঁরা একদিনের কাজ বন্ধের জন্য দিনমজুরের একদিনের রোজগার বন্ধ বলে গেল গেল রব তুলছেন, তাঁরাই আবার শ্রমিক যখন বেঁচে থাকার মতো মজুরির দাবি, তার বোনাসের দাবি নিয়ে আন্দোলন করে, ধর্মঘট করে তখন তার বিরোধিতা করেন। এঁরাই বলেন, আজ এই আর্থিক সঙ্কটের পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের বেশি দাবি করা উচিত নয়। কিন্তু মালিক পুরো মুনাফা না হলে যে কারখানা লক আউট, ক্লোজার করে দিয়ে শ্রমিকদের পথে বসায় সেটা এঁদের চোখে অনুচিত নয়। মালিকরা যখন শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে তখন এসব সংবাদপত্রের পাতায় তেমন কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় না। ডানলপ কারখানা যখন বন্ধ হয়, হিন্দমোটর কারখানায় যখন শ্রমিক ছাঁটাই হয়, তখন এসব সংবাদপত্র মালিকের পক্ষে থাকে। অসংগঠিত শিল্পে শ্রমিকদের প্রতিদিনের ব্যথাবেদনা, তাদের অশ্রুসিক্ত জীবনের ছবি — এসব সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পায়না। খবর-বেচা ব্যবসায়ীদের কাগজে এক কলম জায়গা শ্রমিক পায় যখন সে অভাবে আত্মহত্যা করে, তাও সবসময় নয়, কদাচিৎ। অথচ, আজ হঠাৎই অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য দরদ তাঁদের উথলে উঠছে। তারা বলছে, ২১ মে'র ধর্মঘট নাকি কেবল সংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থের কথা ভেবে করা হয়েছে।

অথচ তারা যে মর্মান্তিক সত্যটি গোপন করে যাচ্ছে, তা হচ্ছে, পূর্বতন কংগ্রেস সরকার এবং বর্তমান বাজপেয়ী সরকারের অনুসৃত আর্থিক নীতিই আজ অসংগঠিত শিল্পের সঙ্কটকে তীব্রতর করেছে। এই আর্থিক নীতিতে আজ ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত শিল্পক্ষেত্রগুলি বৃহৎ একচেটিয়া শিল্পের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ফলে ক্ষুদ্রশিল্পের সঙ্কট বহুগুণ বেড়েছে। তারা ভুলেও একথা উচ্চারণ করছে না যে, ডব্লু টি ওতে যোগদান বা তথাকথিত বিশ্বায়নের ফলে আজ ভারতীয় অর্থনীতি দেশি ও বিদেশি বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আজ ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পে নাভিশ্বাস ওঠার এটা একটা অন্যতম বড় কারণ।

তাই বিজেপি সরকারের ডব্লু টি ও অনুসারী নীতি কেবল সংগঠিত ক্ষেত্র নয় — গোটা ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে তাদের ন্যূনতমভাবে বেঁচে থাকার অধিকারের বিরুদ্ধে কার্যত একটি যুদ্ধ ঘোষণা। দেশের জনগণ আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছে, এ যুদ্ধে হয় সে মরবে, না হয় তাকে লড়তে লড়তে বাঁচতে হবে এবং শেষপর্যন্ত লড়াই করে জিততে হবে। তাই লড়াই ছাড়া এদেশের জনগণের বেঁচে থাকা, বুকভরে নিশ্বাস নেবার জায়গা নেই। এরই অপর নাম বাঁচা। তাই বুর্জোয়া সাংবাদিকরা শোষিত জনগণের ব্যগ্র অভ্যুত্থানে যতই কাঁপুক, এভাবে লড়াইয়ের মধ্যেই রচিত হবে আগামী ক্রান্তিকালের ইতিহাস। এই পচাগলা অর্থনীতির জীর্ণ বসনটি ছাড়া আজ জনগণের হারানোর কিছুই নেই।

বিদেশ সংবাদ

মার্কিন লুটেরাদের কীর্তি

ইরাকের জনগণকে মুক্তি দেওয়ার নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি করছে বলা যায়। আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে রাখার সময় ইরাকের তেল বিক্রির টাকা রাষ্ট্রসংঘের তহবিলে জমা হত এবং ঐ টাকার বিনিময়ে ইরাক খাদ্যশস্য আমদানি করতে পারত। ইরাক দখলের সময় এ বাবদ রাষ্ট্রসংঘের কাছে জমা ছিল ১৩০০ কোটি ডলার। এখন এই বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে 'ইরাক উন্নয়ন তহবিল'-এ। এই তহবিল দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন একদা মার্কিণ ট্রেজারির ডেপুটি সেক্রেটারি এবং এখন ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার একজন কর্মকর্তা পিটার ম্যাকফারসন। অর্থাৎ পুরো অর্থই এখন আমেরিকার দখলে। প্রতি বছর ইরাকের তেল বিক্রির টাকা (২০০০ কোটি ডলার) এই তহবিলে জমা পড়বে। কত বছর ধরে এই লুঠ চলবে, নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে তা বলা হয়নি। এ পর্যন্ত পুনর্গঠনের নামে ৬৮ কোটি ডলারের সবচেয়ে বৃহৎ বরাতটি দেওয়া হয়েছে মার্কিন কোম্পানি বেখটেলকে। ইরাকের তেল শিল্পের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হয়েছে আমেরিকার হ্যালিবারটন কোম্পানির সাবসিডিয়ারি কেলগ ব্রাউন ও রুট কোম্পানিকে। ইরাকিরা নয়, এই কোম্পানির কর্তারাই এখন তেলক্ষেত্রগুলিতে অবাধে ছড়ি ঘোরাচ্ছে।

ইরাকে মার্কিন সরকারের ভূমিকা নিয়ে আমেরিকার জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একটি সমীক্ষা করা হয়। জনমত যাচাইয়ের পরে এটা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, বুশ প্রশাসনের ইরাকি গণবিধবংসী অস্ত্র নিয়ে নিরন্তর প্রচারে সাধারণ মানুষের আর বিশ্বাস নেই। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ৫২ শতাংশ আমেরিকান মনে করছেন, এতদিন জেনেবুঝেই মার্কিন প্রশাসন মিথ্যে কথা বলেছে। আবার সাদ্দাম হুসেনের সঙ্গে আল কায়দার যোগাযোগ আছে, এই অজুহাতও মানতে রাজি নন ৫৬ শতাংশ আমেরিকান। (পি টি আই-এর সংবাদ, বর্তমান ৩.৭.০৩)

<u>জাপান</u>

সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান যুদ্ধসজ্জার প্রতিবাদে উত্তাল

জাপানের সেনাবাহিনীকে সম্প্রসারণ এবং যুদ্ধবাজ করে তোলার জন্য ১৪ মে জাপানের ডায়েট তথা পার্লামেন্টে একটি আইন পাস হবার পর গোটা দেশ এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে।

১৭ মে প্রায় দশ হাজার মানুষ ওকিনাওয়ার একটি খোলা স্টেডিয়ামে মিলিত হয়ে আইনের প্রতিলিপি পোড়ায়।

২১ মে টোকিয়োর শহরতলির বিভিন্ন কলকারখানার ১ হাজার শ্রমিক ডায়েট ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং পরে ডায়েট ভবনের সামনে ধর্ণায় বসে।

২৩ মে হয় বৃহত্তম সমাবেশটি। স্থল, জল ও আকাশ পরিবহন শ্রমিকদের ২০টি সংগঠন এবং জাহাজী শ্রমিকদের কয়েকটি সংগঠনের মোট ৪০ হাজার শ্রমিক এ সমাবেশে যোগ দেয়। তাছাড়া সমাবেশে দেশের ১০০ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীও যোগ দিয়েছিলেন। সভা শেষ হবার পর দুটো মিছিল বার হয়, একটি যায় ডায়েট ভবনের দিকে, অপরটি স্লোগান সহযোগে টোকিয়ো শহরতলির পথ পরিক্রমা করে।

এই জনবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য জনমত গঠন করার কাজে ২৯ মে থেকে শ্রমিকরা নেমে পড়েছে।

২৮ মে টোকিয়ো শহরে এক নাগরিক সভায় AWACS বিমানচালনার ট্রেনিংয়ের বিরোধিতা করা হয় এবং এই সভা থেকে একটা বিশাল বিক্ষোভ মিছিল হামামৎসু ট্রেনিং সেন্টারের সামনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখায়।

এত বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও জাপ সরকার জাপ সেনাবাহিনীকে যুদ্ধবাজ করে তোলার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি, উপরন্তু সেনাবাহিনীর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য F-15 ও AWACS বিমান নিয়ে মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত মহড়াও দিয়েছে। আকাশ পথেই যাতে বিমানে তেল ভরা যায় তারও মহড়া দেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রনিক যুদ্ধের মহড়াও চালানো হয়েছে। এই যুদ্ধ মহড়া উত্তর কোরিয়াকে টার্গেট করেই করা হচ্ছে বলে ওয়াকিবহাল মহল জানিয়েছে।

৩১ মে জাপ টেলিভিশান সংস্থা NHK-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন উপপ্রতিরক্ষাসচিব পল উলফিটস ইরাকে জাপান সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার ও মেডিকেল ব্রিগেডকে পাঠানোর জোরালো আর্জি জানিয়ে এদেরকে 'শান্তিরক্ষক' হিসাবে অভিহিত করেছেন। উত্তর কোরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তিনি জাপানের সহযোগিতাও চেয়েছেন। (সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, (নিউ ইয়র্ক) ১৯ জুন, ২০০৩, ইন্টারনেট থেকে পাওয়া)

<u>জার্মানি</u>

জার্মানিতে মেটাল শ্রমিকদের ধর্মঘট

সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা কাজের দাবিতে পূর্ব জার্মানিতে মেটাল শ্রমিকরা গত তিন সপ্তাহ ধরে ধর্মঘট চালাচ্ছে। ধর্মঘটের দরুণ মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্পে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপের বৃহত্তম মোটরগাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা ভোক্সওয়াগনের ড্রেসডেন এবং ঝিকাউ কারখানায় ২৩ জুন থেকে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মেটাল শ্রমিকদের ধর্মঘটের দরুণ কাঁচামাল সরবরাহে টান ধরেছে অজুহাত দেখিয়ে বিলাস-বহুল গাড়ি নির্মাতা সংস্থা BMW তাদের কারখানায় অনির্দিষ্টকালের জন্য লে-অফ ঘোষণা করে ১০ হাজার শ্রমিককে কাজ থেকে বসিয়ে দিয়েছে। (সূত্র ঃ টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ২৪ জুন ২০০৩)

৬০ শতাংশ বিশ্ববাসী প্রেসিডেন্ট বুশের ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে

'বিশ্ব আমেরিকা সম্পর্কে কি ভাবছে' এই শিরোনাম সম্বলিত এক অনুষ্ঠানে ১৭ জুন বিশ্বের ১১টি দেশের ১১ হাজার মানুষকে নিয়ে এক ভোট সমীক্ষার আয়োজন করেছিল বিবিসি। এই ১১টি দেশ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইজরায়েল, ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকা। এই সমীক্ষায় ৮১ শতাংশ রুশ ও ৬৩ শতাংশ ফরাসি, প্রেসিডেন্ট বুশের ইরাক আক্রমণের সিদ্ধান্তকে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলেছে। (সূত্র ঃ ডেকান হেরাল্ড, ১৯ জুন ২০০৩)

২৯ জুলাই ছাত্র ধর্মঘট

ছাত্র-অভিভাবকদের মিলিত সংগ্রামই এই আক্রমণ রুখতে পারে

একের পাতার পর

ছাত্রছাত্রী মহার্ঘ্য শিক্ষার সুযোগ পাবে তাদের মধ্যেও যাতে যুক্তিভিত্তিক মানসিকতা গড়ে না ওঠে তার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

একথা ঠিক যে, স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের স্বাধীন সরকার কোনদিনই রামমোহন-বিদ্যাসাগর - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেনি। দেশের সমস্ত ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেওয়ার যে স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন তাকে রূপ দিতে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি সরকার নিযুক্ত বি জি খের কমিশন ও কোঠারী কমিশনের সুপারিশ মেনে কোনদিনই শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করেনি। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭.২ শতাংশ থেকে কমে এখন তা ১.১৮ শতাংশে নেমেছে। 'ছাত্রদের আয়ের উৎস হিসাবে দেখা উচিত নয়' — এই কথা বলে কোঠারী কমিশন ধীরে ধীরে অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার কথা বলেছিল। কিন্তু ছাত্রদের ফি মকুব করা তো দূরের কথা, যতদিন গেছে ততই শিক্ষার ব্যয়ভার বেড়েছে। পাশাপাশি 'জব ওরিয়েন্টেড' শিক্ষার নামে বৃত্তিমুখী শিক্ষার উপর জোর দিয়ে সাধারণ শিক্ষার গুরুত্বকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৮৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলেন তাতে শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিটাই পাল্টে দেওয়া হল। বলা হল, আর পাঁচটা বাণিজ্যিক পণ্যের মতো শিক্ষাও একটা পণ্য। তাকে নিয়ে ব্যবসা করা চলে। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের আহবান জানানো হল শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার জন্য। রাজীব গান্ধী সরাসরি বললেন, 'শিক্ষা হল বিনিয়োগের ক্ষেত্র।' এখানেই বাণিজ্যকরণের সূচনা। আর তার পথ ধরে শুরু হল শিক্ষার বেসরকারীকরণ। পরবর্তীকালে জনতা, কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট ও বিজেপি — সমস্ত সরকারই রাজীব গান্ধীর জাতীয় শিক্ষানীতিকেই কার্যকর করেছে। নরসীমা রাও সরকার এনেছে 'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বিল' — যে বিলের মধ্য দিয়ে বেসরকারি সংস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঢালাও অনুমতি দেওয়া হল, শুধু ১০ কোটি টাকার গ্যারাণ্টি মানি থাকলেই হল। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি ধার্য করার অধিকার, ডোনেশান নেওয়ার অধিকার, এমনকি সিলেবাস তৈরি করার অধিকার সবই সেই মালিকের হাতে থাকবে। এমনকি যে কোন সময় যেকোন অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার অধিকারও থাকবে সেই মালিকের। এই পথেই এল 'সেল্ফ ফিনান্সিং কলেজের স্কীম' — যেখানে পড়াশুনার সমস্ত খরচই দিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। এমনকি সরকারি বা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্স চালু হচ্ছে। এরপর বিজেপি সরকার অতীতের সমস্ত ঐতিহ্য ভেঙে দুজন শিল্পপতি কুমারমঙ্গলম বিড়লা এবং মুকেশ আম্বানির নেতৃত্বে বসালো একটি শিক্ষা কমিশন। **খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা রায় দিল, সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজের ফি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমান করতে হবে। না হলে বেসরকারি মালিকদের শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা দাঁড়াবে না।**

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন সি পি এম এবং তার ছাত্র সংগঠন এস এফ আই শিক্ষার বেসরকারীকরণের মৌখিক বিরোধিতা করলেও এখন তাদের নেতৃত্বে বামফ্রণ্ট সরকার নিজেই বেসরকারীকরণের রাস্তাতেই হাঁটছে। ইতিমধ্যেই এ রাজ্যে খোলা হয়েছে ৪২টি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এ বছর ৪০ জন শিল্পপতি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলার অনুমতি চেয়েছিল। তার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬টি কলেজ খোলার অনুমতি মিলেছে। এইসব কলেজে ভর্তি হতে লাগছে ৪০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা, এবং মাসিক বেতন তিন থেকে চার হাজার টাকা। এত টাকা খরচ করে যারা পড়ছেন তাদের জন্য এইসব কলেজে উপযুক্ত পরিকাঠামো এমনকি ল্যাবোরেটরি বা ওয়ার্কশপ — যা প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি, তারও অভাব আছে। শিক্ষা নিয়ে যারা ব্যবসা করবে তাদের কাছে আর কী-ই বা আশা করা যায়! প্রতি বছর ২৫০০০ ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে। তাদের কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ রাজ্য সরকার করছে না। যারা ইতিমধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন তাদের ৭৮ শতাংশ চাকরি পাননি। শুধু বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজই নয়, বেসরকারি আইন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে, সেখানে মাসিক বেতন এক হাজার টাকা। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ খোলার তোড়জোড় চলছে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে, বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ খোলার অনুমতি চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে ২০০টি দরখাস্ত জমা পড়েছে। তিনি বলেছেন, অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কার্পণ্য করবে না। খুব সহজে অনুমান করা যায়, শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার জন্য যারা কলেজ খুলবে তারা কী পরিমাণে ফি ধার্য করবে। সরকার নিয়ন্ত্রিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই ফি বেড়েছে, ফি বেড়েছে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও। এ বছর বাড়তে যাচ্ছে মেডিকেল কলেজের ফি। এম বি বি এস কোর্সের জন্য ভর্তি ফি ২৫০ টাকা থেকে বেড়ে হবে ১০০০ টাকা, টিউশন ফি মাসিক ১৮ টাকা থেকে বেড়ে হবে ১০০০ টাকা, হোস্টেলের সিট রেণ্ট মাসিক ১২ টাকা থেকে হবে ৫০০ টাকা এবং কশান মানি ২০০ টাকা থেকে হবে ১০০০ টাকা। অনাবাসী ভারতীয়দের চার বছরে কোর্স ফি ৯ লক্ষ টাকা। এছাড়াও প্রতিটি মেডিকেল কলেজে ১৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে তাদের জন্য যারা ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে ভর্তি হতে পারবে। তাদের ক্ষেত্রে খরচ হবে চার বছরে ১৮ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য যে সরকারি ব্যবস্থা আছে তাও বেসরকারীকরণ হচ্ছে। এবার যে কেউ এই প্রশিক্ষণ নিতে চাইবে তার গুণে দিতে হবে ২৫ হাজার টাকা। শুধু তাই নয়, যে সি পি এম ও তার ছাত্র সংগঠন এস এফ আই গত ২৬ বছর ধরে স্কুলস্তরে 'অবৈতনিক' শিক্ষা চালু করার জন্য বামফ্রণ্ট সরকারকে লাল সেলাম জানিয়ে এসেছে তারাই এখন স্কুল স্তরেও টিউশন ফি চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। 'অবৈতনিক' তক্‌মার আড়ালে নানা নামে এখন ফি নেওয়া হয়; বেশিরভাগ জায়গাতেই স্কুল কলেজ কর্তৃপক্ষ সরকার নির্ধারিত ফির চেয়ে অনেক বেশি ফি নিচ্ছে। যেমন একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য বহু স্কুলে ১৫০০/২০০০ টাকা বা তার চেয়ে বেশি টাকা নিচ্ছে, এর বাইরেও নিচ্ছে ডোনেশন। এর বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বরং স্কুলের উন্নয়নের জন্য অর্থবরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে উন্নয়ন ফি বৃদ্ধি করার জন্য প্ররোচিত করছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভর্তি সমস্যা। কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক তুলে দিলেও সরকার উপযুক্ত সংখ্যক উচ্চমাধ্যমিক স্কুল খুলছে না, বা কিছু উচ্চমাধ্যমিক স্কুল চালু করলেও উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলছে না। হিন্দী ও উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও ব্যাপক আকার নিয়েছে। এই ভর্তি সমস্যার সুযোগ নিয়ে বহু স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রচুর পরিমাণে ফি নিচ্ছে, নিচ্ছে ডোনেশান। পাশাপাশি রাজ্য সরকার এ বছর শিক্ষার উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ ২৫৬ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৯৫ কোটি টাকা করেছে। এটা সহজেই অনুমান করা যায় এই বাজেট ছাঁটাই ছাত্রছাত্রীদের উপর বাড়তি ফি চাপিয়ে তুলে নেওয়া হবে। ফলে শিক্ষার ব্যয়ভার আরও বাড়বে এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে গরিব-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা।

শিক্ষা তথা ছাত্রসমাজ আজ যখন এরকম সর্বাত্মক আক্রমণের মুখে তখন ছাত্র পরিষদ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তো বটেই, এমনকি রাজ্যের বৃহত্তম বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের দাবিদার এস এফ আই কার্যকরী কোন আন্দোলন গড়ে তুলছে না। বরং তারা তাদের সম্মেলনে ফি বৃদ্ধির পক্ষে জনমত তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একমাত্র এস ইউ সি আই দল এবং ছাত্র সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ডি এস ও দীর্ঘদিন ধরে সরকারের এই শিক্ষাস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছে। তাদের নেতৃত্বে রাজ্যের জেলায় জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ীতে আন্দোলন রক্তাক্ত রূপ নিয়েছে। বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশ ও র‍্যাফের আক্রমণে আহত হয়েছে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী, পালিত হয়েছে সর্বাত্মক হলদিবাড়ী বন্ধ। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে সাবধান হাইস্কুলে আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। মেদিনীপুরের রাঙামাটি স্কুলে এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর এস এফ আই কর্মীরা আক্রমণ করেছে, পরে ডি আই অফিসে ডেপুটেশন দিতে গেলে সি পি এমের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা চালিয়েছে। অতীতেও যখনই ডি এস ও শিক্ষা ও ছাত্রস্বার্থে আন্দোলনে নেমেছে, বারবার কর্মীদের রক্তাক্ত হতে হয়েছে সি পি এম ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর হাতে। কিন্তু তার দ্বারা আন্দোলন থামেনি, তা এগিয়েছে। এবারও তার অন্যথা হবে না। গোটা জুলাই মাস ধরে চলবে আন্দোলন। পাশাপাশি চলবে আন্দোলনের হাতিয়ার স্কুলে কলেজে ছাত্রসংগ্রাম কমিটি গঠন। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সমস্ত জেলাতেই মহকুমা ও জেলা ভিত্তিক বিক্ষোভ আন্দোলন চলতে থাকবে। তার ধারাবাহিকতাতেই আগামী ২৯ জুলাই সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য যিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন সেই মহান মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে এই ছাত্র ধর্মঘট সফল হওয়ার মধ্য দিয়ে সূচনা হবে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের। শিক্ষার এই দাবি শুধু ছাত্রদের নয়, গোটা সমাজের নৈতিকতা-মনুষ্যত্ব রক্ষার প্রশ্নটি আজ এই আন্দোলনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই সর্বস্তরের মানুষকেই এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে হবে।

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য বহু স্কুল ১৫০০/২০০০ টাকা বা তার চেয়ে বেশি টাকা নিচ্ছে, এর বাইরেও নিচ্ছে ডোনেশন। এর বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বরং স্কুলের উন্নয়নের জন্য অর্থবরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে উন্নয়ন ফি বৃদ্ধি করার জন্য প্ররোচিত করছে।

লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক ধানও সংগ্রহ করেনি রাজ্য সরকার

রাজ্যে চাষিদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের তথ্য চেয়ে এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা দেবপ্রসাদ সরকারের এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী যা জানিয়েছেন, তাতে সরকারি প্রতিশ্রুতি নেহাতই ছেলেখেলা বলে প্রমাণিত হয়।

এবছর ধান ওঠার পর চাষিরা তা বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে টের পায় দাম এত কম যে, ধানের উৎপাদন ব্যয়টুকু উসুল করা চাষির পক্ষে দুঃসাধ্য। অভাবী বিক্রি হয়, দেনায় দায়ে ও অভুক্ত পরিবারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে চাষির আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে।

সরকার উদ্বেগের ভাব দেখিয়ে ঘোষণা করে, ৫৩০ টাকা কুইণ্টাল দাম দিয়ে সরকার চাষিদের কাছ থেকে দেড় লক্ষ টন ধান কিনবে। 'বেনফেড' সংগ্রহ করবে ১ লক্ষ টন এবং ই সি এস সি করবে ৫৫ হাজার টন। এবছর উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে দেড় কোটি টন সেখানে দেড় লক্ষ টন ধান কেনার সিদ্ধান্তই চাষিদের প্রতি ছলনা।

বাস্তবে এই ঘোষণারও কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, দেবপ্রসাদ সরকার সেটাই মন্ত্রীর কাছে জানতে চান। মন্ত্রী জানালেন, এ পর্যন্ত বেনফেড সংগ্রহ করেছে ২৬,৪০৩.৭০ টন এবং অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম সংগ্রহ করেছে ১৩০ টন। অর্থাৎ সরকারি প্রতিশ্রুতি অর্ধেকও পূরণ করা হয়নি। সংগ্রহ এত কম কেন, দেবপ্রসাদবাবুর এই প্রশ্নের উত্তর খাদ্যমন্ত্রী দেননি। এ জন্যও লিখিত প্রশ্ন দাবি করেন মন্ত্রী!

আন্দোলনকে বলছে বিশৃঙ্খলা

একের পাতার পর

আইনে পরিণত হতে আটকাবে না। অর্থাৎ এমন কিছু তাঁরা করেননি যাতে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে বাড়তি মুনাফা করতে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের অসুবিধা হয়। আবার এর দ্বারা নির্বাচনের সময় তাঁরা যে এর বিরোধিতা করেছিলেন তা দেখিয়ে জনগণকে ঠকাতেও তাঁদের অসুবিধা হবেনা। অর্থাৎ সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। একইভাবে যে-সব রাজ্যে তাঁরা ক্ষমতায় নেই সেখানে তাঁরা গদি দখলের জন্য আন্দোলনের মহড়া দেবেন। আবার পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু তাঁরা সরকারে আছেন, তাই মুখে বিরোধিতা করতে করতেই কেন্দ্রের দোহাই দিয়ে সেই আইনকে গোয়েঙ্কার স্বার্থে তাঁরা কার্যকরী করবেন। সি পি এম নেতৃত্বের এই দু-মুখো চরিত্র জনসাধারণকে ভালো করে বুঝতে হবে।

যদি সি পি এম নেতৃত্ব সত্যিই আন্দোলন চাইতেন, তাহলে জনস্বার্থে বিদ্যুৎ বিল ২০০৩ রুখে দেওয়াকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে রেখে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যা যা করা দরকার তাই তাঁরা করতেন। প্রয়োজনে সরকার ও প্রশাসন অচল করে দিতেও তাঁরা পিছপা হতেন না। পঞ্চাশের দশকে, ষাটের দশকে এমন তেজ ও মনোভাব নিয়েই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলনের তুফান তুলেছিল, যাকে সি পি আই, সি পি এম নেতৃত্ব ব্যালট বক্সে নিয়ে গিয়ে শেষ করেছেন। '৫৩ সালের ট্রামভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, '৫৬ সালের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, '৫৯ এবং '৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন, এমনকি '৬৮ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার বিরুদ্ধে কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলন সহ ছোটবড় বহু আন্দোলন প্রশাসনকে বহুলাংশে অচল করে দিয়েছিল। জনসাধারণের চোখে সেই লড়াই ছিল অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ এবং সেই অন্যায় জুলুম রুখে দেওয়ার লড়াই। আর শাসক কংগ্রেস এবং তাদের প্রভু মালিকশ্রেণীর চোখে তা ছিল 'অগণতান্ত্রিক,' ' বিশৃঙ্খলা' ও 'অশান্তি।' কংগ্রেসী শাসকদের মত সমস্ত স্বৈরাচারী শাসকদের কথাগুলোই এখন তোতাপাখির মত আওড়াচ্ছেন সি পি এম নেতারা, কারণ আজ এ রাজ্যে ক্ষমতায় বসে আন্দোলন ভাঙার হীন ভূমিকা তাঁরা নিয়েছেন।

তাঁরা বলছেন, আন্দোলন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করতে হবে এবং এখন তাঁরা নাকি সেটাই করতে চাইছেন। এজন্য তাঁরা এখন মিটিং মিছিলের দিনক্ষণ, জায়গা সব নির্দিষ্ট করে দিতে চাইছেন। এজন্য 'জনগণের অসুবিধা হচ্ছে' বলে প্রচার তুলছেন এবং অসচেতন জনগণকে শুধু নয়, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষদেরও বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। তাঁরা বলছেন, যখনতখন যত্র তত্র মিটিং মিছিল অবরোধ চলবে না, ঘেরাও তো একেবারেই চলবে না। দেশবিদেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সি পি এম নেতারা "উন্নয়নের" দোহাই দিয়ে এসব পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সমর্থন পাচ্ছেন চেম্বার্স অব কমার্সগুলির এবং একচেটিয়া সংবাদপত্রগোষ্ঠীর। বুর্জোয়ারা এবং তাদের প্রচারমাধ্যম সবসময়ই যে 'রেসপনসিবল অপজিশন' এবং 'কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম', অর্থাৎ 'দায়িত্বশীল বিরোধী' এবং 'গঠনমূলক সমালোচনা'র কথা বলে, সি পি এম নেতারা এখন তার সমর্থক হয়েছেন। এই 'রেসপনসিবল অপজিশন' বলতে বুর্জোয়ারা বোঝায় এমন বিরোধী পক্ষ যাদের কার্যকলাপের দ্বারা বর্তমান শোষণমূলক ব্যবস্থার গায়ে আঁচড় পর্যন্ত না লাগে এবং 'কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম' বলতে বোঝায় এমন সমালোচনা যার দ্বারা বর্তমান শোষণমূলক ব্যবস্থা আরও মজবুত ও পাকাপোক্ত হয়। ইতিপূর্বে এই কাজটি বুর্জোয়াদের চিহ্নিত দলগুলিকে দিয়ে করাতে গিয়ে বহু চেষ্টা করেও তারা সফল হয়নি। সিপিএম-এর গায়ে মার্কসবাদী তক্‌মাটি থাকার ফলে এখন এ কাজে তাদের খানিকটা সুবিধা হচ্ছে।

আনন্দবাজারও ৫ জুলাই সম্পাদকীয়তে আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি'র প্রশ্ন তুলেছে। এসব প্রশ্ন যাঁরা তুলছেন তাঁরা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এ-প্রশ্ন তুলছেন না যে, কেন মানুষ আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হয়? কেন মানুষ রোদে পুড়ে জলে ভিজে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করে পথে নামে? পথ অবরোধ হলে জ্যামে কিছু মানুষের কষ্ট হয়, কিন্তু যারা পুলিশের লাঠিগুলি খেয়েও পথে নামে তারা কি আরামে অবরোধ করে? তারা ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য বা অন্যায়-জুলুমের প্রতিবাদ করতে অনেক কষ্ট স্বীকার করেই আন্দোলন করে জনস্বার্থে। এই দিকটি, অর্থাৎ আন্দোলনের ন্যায্য দাবি এবং জনস্বার্থের দিকটি মালিকশ্রেণীর মদতপুষ্ট দল ও সংবাদপত্র সর্বদাই চেপে যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আন্দোলন ও আন্দোলনের পদ্ধতি গণতান্ত্রিক কিনা। কোন আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন কি না, কোন্ মাপকাঠিতে তার বিচার হবে? বিচারের মাপকাঠি একটাই— তাহল আন্দোলনের দাবি গণতান্ত্রিক কিনা, ন্যায্য কিনা। অর্থাৎ আন্দোলনের দাবি যদি গণতান্ত্রিক হয় তবে অবশ্যই তা গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু আন্দোলনের পদ্ধতি কী হবে, তা শান্তিপূর্ণ থাকবে কি থাকবে না, সেটা নির্ভর করে সরকারের ভূমিকার ওপর। কারণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য থাকে জনগণের স্বার্থে ন্যায়সংগত দাবি আদায়। যদি সরকার গণতান্ত্রিক চরিত্রের হয়, জনমতের মূল্য দেয়, দাবিগুলি ন্যায্য হলে তার স্বীকৃতি দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করে, তাহলে আন্দোলন ধাপে ধাপে তীব্র করারও দরকার হয় না এবং তা কখনই অশান্ত রূপ নেয় না। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দোহাই পেড়ে সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর নির্মমভাবে নির্বিচারে লাঠি-গুলি চালিয়ে সরকারই তাকে অশান্ত করে তোলে। আর তাদের অত্যাচারের ফলে যখনই আন্দোলন অশান্ত রূপ ধারণ করে তখনই অত্যাচারী শাসকরা আন্দোলনের পদ্ধতির প্রশ্ন তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে আন্দোলনের ন্যায্য দাবিগুলিকে অস্বীকার করে। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার ন্যায্য দাবি এবং তা অর্জন করার লক্ষ্যটিকে গৌণ করে পদ্ধতির প্রশ্ন যারা তুলেছে তারা ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, সূর্য সেন, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লাকে খুনি বলেছে — বিপ্লবী নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর সরকারি আচরণবিধি চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্নের জবাবে সাহিত্যিক শরৎবাবু বলেছিলেন "গভর্ণমেণ্ট কি আমাদের কনসেন্স কীপার হবে নাকি" অর্থাৎ সরকার কি আমাদের বিবেকের অভিভাবক হবে? উৎপীড়ক অত্যাচারী জুলুমবাজের সম্মতি নিয়ে, তাদের নির্দেশ মেনে তাদের আচরণবিধি অনুযায়ী প্রতিবাদ করতে হবে? এ প্রশ্ন অতীতে বারবার উঠেছে। বাংলার বিপ্লববাদের সমর্থনে শরৎবাবু আরও বলেছিলেন যে, শাসক আর শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি এক হলে জাতির বড় দুর্দিন।

যে সরকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে "গণতান্ত্রিক পদ্ধতি"-র দোহাই দেয়, সেই সরকার নিজেই গণতান্ত্রিক দাবি, রীতিনীতি কিছুই মানে না। সামান্য নর্দমা পরিষ্কার, রাস্তা সারাইয়ের দাবি, সমাজবিরোধীদের উৎপাত বন্ধ করার দাবিতে প্রশাসনকে সক্রিয় করাতে হলেও এ-রাজ্যে পথ অবরোধ করতে হয়।

গভীরভাবে ভাবলে যে কেউই বুঝবেন, আন্দোলনের পথ ফুলে ঢাকা নয়। শাসকদলের ছত্রছায়ায় পুলিশি নিরাপত্তায় ভোটের স্বার্থে 'আন্দোলন আন্দোলন' খেলা করা সহজ — যা কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন জোটের শরিক ও অন্য ভোটসর্বস্ব দলগুলি করে থাকে। কিন্তু যে আন্দোলন জনগণকে জাগায়, জনমত গঠন করে ন্যায্য দাবি আদায়ের উপযুক্ত জনশক্তি গড়ে তুলতে চায় — সে আন্দোলনের পথ খুবই কঠিন। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তাকে গড়ে তুলতে হয়। ন্যায্য দাবি গণতান্ত্রিক দাবি যদি সরকার মেনে নেয় তবে বহু আন্দোলন, বহু বিরোধের মীমাংসা অনেক আগেই হতে পারে। কিন্তু তা হয় না, কারণ যে সরকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে "গণতান্ত্রিক পদ্ধতি"-র দোহাই দেয়, সেই সরকার নিজেই গণতান্ত্রিক দাবি, রীতিনীতি কিছুই মানে না। সামান্য নর্দমা পরিষ্কার, রাস্তা সারাইয়ের দাবি, সমাজবিরোধী-দের উৎপাত বন্ধ করার দাবিতে প্রশাসনকে সক্রিয় করাতে হলেও এ-রাজ্যে পথ অবরোধ করতে হয়।

যাঁরা আন্দোলনের ওপর আচরণবিধির নামে সরকারি ও কানুনি লাগাম পরাতে এত ব্যাগ্র, তাঁরা সরকার ও প্রশাসনকে আচরণবিধি মানতে বাধ্য করতে তৎপর নয় কেন? প্রতিদিন কত ছাঁটাই শ্রমিক চাকরি হারিয়ে, কত বৃদ্ধ শিক্ষক পেনশন না পেয়ে, কত কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে দিনের পর দিন অভুক্ত স্ত্রী-পুত্রকন্যার কান্নায় অস্থির হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে আছে, কত জন সপরিবারে আত্মহত্যা করছে, কত বেকার যুবক অভাবের তাড়নায় শাসকদলের হাতে সমাজবিরোধীতে পরিণত হচ্ছে — তাদের সামনে বাঁচার কী শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পথ খোলা আছে? যখনই অন্যায়ের প্রতিবাদে ধর্মঘট বয়কট অবরোধের কথা বলা হয় তখনই শাসকরা বলে — প্রতিবাদের বহু গণতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক পথ খোলা আছে, কাজেই ধর্মঘট, অবরোধ-ঘেরাও ইত্যাদির দরকার কী! নিয়মতান্ত্রিক পথে একজন ছাঁটাই শ্রমিক শ্রমট্রাইবুন্যালে আবেদন করলে সে প্রতিকার পায়? বছরের পর বছর মামলা ট্রাইবুনালে পড়ে থাকে, মীমাংসা হয় না। তাতে মালিকের ক্ষতি হয় না, কিন্তু শ্রমিকের মৃত্যু ছাড়া অন্যপথ খোলা থাকে না। নানা ন্যায্য দাবি নিয়ে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, সর্বস্তরের মানুষের কত প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে, কত স্মারকলিপি, আবেদন জমা হচ্ছে, কত ডেপুটেশন দেওয়া হচ্ছে, সরকারের মন্ত্রীদের তা দেখবার বা শোনবার সময়টুকু পর্যন্ত হয় না। অথচ, শিলান্যাস, ফিতে কাটা, নন্দনের ফিল্ম উৎসব, মালিকদের অসুবিধা দূর করতে তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনার সময় তাঁরা পান। কিন্তু শ্রমিক ন্যায্য পাওনা চাইলে, কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম চাইলে, বেকার যুবক জীবিকার পথ চাইলে "শান্তির রাজত্বে" পায় সরকার ও প্রশাসনের উপেক্ষা, পুলিশের লাঠিগুলি। তথাকথিত "শান্তির রাজত্ব" — মালিকের মুনাফা, প্রশাসন ও সরকারি মন্ত্রী ও অফিসারদের বিলাস, আরামআয়েস নিশ্চিত করে, কিন্তু সাধারণ মানুষের বুকের ব্যথা প্রকাশের পথটুকু "শান্তিশৃঙ্খলার" পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে । এ-দিকটি লক্ষ্য করেই শরৎচন্দ্র বলেছিলেন — "অশান্তি ঘটিয়ে তোলা মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়।" অর্থাৎ শান্তি-অশান্তির প্রশ্নটাও শাসকদের চোখে দেখা চলে না।

জনগণের কল্যাণ, জনগণের স্বার্থই আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিচারের মাপকাঠি। সরকার ও আইন-কানুন যতদিন মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর পক্ষে থাকবে, এবং সেই মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ওপর চরম শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার চলবে, বিবেকের নির্দেশে মানুষের প্রতিবাদ ততদিনই আইনের শৃঙ্খল ভেঙে যাবে। আইনি বেড়ি, আচরণবিধির শৃঙখল কিংবা রাষ্ট্রীয় দমননীতির দ্বারা তাকে রোখা যাবে না। ব্রিটিশ পারেনি, কংগ্রেস-বিজেপি পারেনি, কোন দেশের শোষক-শাসক তা পারেনি, সি পি এম নেতৃত্বও তা পারবে না। আন্দোলনের পথেই গড়ে উঠবে মুক্তির ইতিহাস।

১৯ জুলাই সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা বিদ্যুতের আলো বর্জন করুন

মুর্শিদাবাদে শিশুমৃত্যু

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির তদন্ত রিপোর্ট

[মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রতিক শিশুমৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'পশ্চিমবঙ্গ হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'র উদ্যোগে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবীদের নিয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি বিভিন্ন আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট তৈরি করে। বি সি রায় শিশু হাসপাতালের ঘটনার পরও এই সংস্থার পক্ষ থেকে তদন্ত করে সরকারের কাছে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। গত ২৬ জুন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অসীম রায়চৌধুরী, ডাঃ শ্যামাপদ দত্ত, ডাঃ অশোক সামন্ত, ডাঃ কিসান প্রধান, ডাঃ বিজ্ঞান বেরা প্রমুখ এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে 'গণদাবী' ৫৫ বর্ষ ৪৫ সংখ্যায় মৌখিক আলোচনার ভিত্তিতে এই রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করা হয়েছিল। এখানে পুরো রিপোর্টটি প্রকাশ করা হল। — সম্পাদক, গণদাবী]

মুর্শিদাবাদের ঘটনায় তদন্ত কমিটির দাবি

১) **বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে** — অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের তত্ত্বাবধানে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও মেডিক্যাল সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। নাইসেড ও পুণে ভাইরোলজি সংস্থার বক্তব্যকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যুক্ত করতে হবে।

২) **দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ** — দোষী ব্যক্তিদের — তিনি কর্তাব্যক্তি হ'ন আর চিকিৎসক-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী হ'ন — দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

৩) **যুদ্ধকালীন তৎপরতার ছিটেফোঁটাও ছিল না** — দু'চার জন ডাক্তার ছুটি নিলেও সরকার চাইলে জুনিয়র ডাক্তার, পি জি টি, বিশেষজ্ঞ কোনটাই পাঠানোর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তা তো হয়ইনি, রাইটার্সে রিজার্ভ চিকিৎসকদেরও পাঠানো হয়নি। তাই চিকিৎসার গাফিলতির দায়ভার শুধু ডাক্তারদের নয় — প্রশাসনেরও বটে।

৪) **মানবিক দৃষ্টিতে জেলা-সফর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি জরুরি কর্তব্য** — মুখ্যমন্ত্রী নিজে জেলাতে গিয়ে এই জায়গায় প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বন্ধ প্রত্যাহার করাতে পারেন, কিন্তু স্বাস্থ্য প্রশাসনের মূল দায়িত্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রীর।

৫) **শাস্তিপ্রদান ও কর্মসংস্কৃতি** — মুখ্যমন্ত্রীর জরুরি কর্মোদ্যোগ শুধু ডাক্তারদের শাস্তির দিকে। জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন, অন্যান্য স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যাপারে সরকার মুখ খুলতে অপারগ। এই দাওয়াই মুখ্যমন্ত্রীর পুরনো এবং ফলদায়ী নয়।

৬) **বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সরকার ও মন্ত্রীরা বিকৃত করেছেন** — ভাইরাস নির্ণয় ও জরুরি চিকিৎসা দুটি আলাদা বিষয়। জরুরি তৎপরতা ও চিকিৎসার চরম গাফিলতিতে বেশিরভাগ মৃত্যু ঘটেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসাও নেই — প্রয়োজনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া উচিত। ভাইরাসের চিকিৎসা ব্যয়বহুল, সাধারণভাবে প্রয়োগ হয় না — এটা ঠিকই। কিন্তু শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি, জ্বরের ওষুধ বাস্তবে রয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োগ করা হল না, যার ফলশ্রুতিতে শিশুমৃত্যু আরও বাড়ল। অপুষ্টির ঘাড়ে দোষ চাপানো হল বটে, কিন্তু সবাই জানেন এতে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ শিশুই ভুগছে এবং স্বাধীনতার এত বছর পরেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই মূল বিষয়ে নিশ্চুপ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে হেয় না করেও বলা যায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রসঙ্গ টেনেছেন তাতে তিনি একদিন হয়ত এমনও বলবেন — "অপুষ্টিও ভাল হবে ঝাড়ফুঁকে'। বিজ্ঞানকে বিকৃত করা আজ মন্ত্রীমহোদয়দের প্রাত্যহিক রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭) **যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, ওষুধ কেনার জন্য পয়সা নেই রোগীর আত্মীয়দের** — ২৬ বছর অতিক্রান্ত হল বামফ্রন্ট সরকারের। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা, লালগোলা, জঙ্গিপুর ইত্যাদির মতো প্রত্যন্ত গ্রামে উপযুক্ত রাস্তাঘাট তারা জনগণকে উপহার দিতে পারেনি। ফলে ব্লক, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে সংকটগ্রস্ত রোগী ভর্তি করা এক সমস্যাবহুল ব্যাপার। এছাড়া অশিক্ষার অভিশাপ সাধারণ মানুষের ওপর এমনই চেপে বসেছে যে প্রতিষেধক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। আর এক্ষেত্রে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশিকাও দিতে পারেননি। ফলশ্রুতিতে এতগুলি শিশুমৃত্যু ঘটল।

৮) **রোগীকে উচ্চতর হাসপাতালে পাঠানোর যথার্থ নিয়মের অভাব** — বি সি রায় হাসপাতালের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটিকে আমরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলাম তা মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রেও দিবালোকের মত সত্য হল। অর্থাৎ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মহকুমা, জেলা হাসপাতাল এমনকি কলকাতাতেও সংকটগ্রস্ত রোগী পাঠানোর যথার্থ নিয়ম নেই।

৯) **বিশুদ্ধ পানীয় জল, পুষ্টি, প্রতিষেধক, পরিবেশ ও ভ্যাক্সিন** —শিশুদের ক্ষেত্রে এগুলি জরুরি প্রয়োজনীয় বিষয়—তা গ্রামেই হোক, আর শহরেই হোক। কিন্তু এই পরিষেবা সংকটগ্রস্ত শিশুরা পাচ্ছে না। তাই অকারণে পেটের অসুখ ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগ বাড়ছে এবং বহু শিশু মারা যাচ্ছে। ২০০২ সালে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে শতকরা ৫০ ভাগ আর্থিক অনুদান কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করলেও নিচু স্তরের যে সমস্যা আগেও ছিল তা এখনো রয়ে গেছে। সরকার আজ বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ, ইঙ্গ-জার্মান সাহায্য ছাড়া এক পা-ও এগোতে পারছে না। ফলশ্রুতিতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা রয়ে গেছে। ওষুধের জন্য অর্থ বরাদ্দ নেই। ফলে শিশুস্বাস্থ্যের জন্য ন্যূনতম পরিবেশ আজ নেই।

আত্মীয়-পরিজনদের বক্তব্য

রোগ সম্পর্কে ঃ অত্যধিক জ্বর, ১০০°-১০৩° ফারেনহাইট, সর্দি, শ্বাসকষ্ট, কারো কারো খিঁচুনি। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে আক্রান্তরা দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

১) গ্রামে পাড়ায় এম এইচ ডব্লু, স্বাস্থ্য-সুপারভাইজার আসেননি। কেউ কেউ এলেও এ বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে জানাননি। প্রথম বৈদ্যুতিন মাধ্যম থেকে সি এম ও এইচ-এর ঘুম ভাঙে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে।

২) ডাক্তারদের দেখা সাক্ষাৎ মেলেনি।

৩) দ্রুত রোগী সংকটজনক অবস্থায় চলে যায়, তাই স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মহকুমা হাসপাতালে অনেককে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

৪) গ্রামগঞ্জের রাস্তাঘাট খারাপ। যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

৫) গ্রামগঞ্জে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই ও প্রতিষেধক টীকাকরণ আংশিক হয়েছে।

৬) রোগ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ জানেন না, তাঁরা আতঙ্কিত ও তাদের কী করণীয় তাও জানানোর লোক নেই।

৭) এক্স-রে, অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না। বেডেরও ব্যবস্থা নেই। চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ও স্যানিটেশন নেই বললেই চলে। মেঝেতে কোনমতে চাদর ইত্যাদি পেতে হা-হুতাশ করে বসে থাকা ছাড়া আত্মীয়দের উপায় নেই।

৮) ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। জ্বরের ওষুধ ও অ্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। ওষুধ কেনার ক্ষমতা নেই সাধারণ মানুষের। হইচই হওয়ার পর প্যারাসিটামল, কোট্রিম্যাক্সাজোল ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

৯) কোনও অ্যাম্বুলেন্স নেই, কোনও মোবাইল চিকিৎসা ভ্যানও নেই।

সংগৃহীত তথ্য

ভগবানগোলা ১ নং ও ২ নং এবং লালগোলা অঞ্চল ঃ

১) নসিপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ

ডাক্তার ৪ জন(বি এম ও এইচ) -শিশু বিশেষজ্ঞ, ১ জন আয়ুর্বেদ, ১ জন চুক্তিভিত্তিক, নার্স-৬ জন।

বেড ১০টি।

বিছানা নেই, চাদর নেই, এক্স-রে, অক্সিজেন নেই। ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না।

অজানা জ্বরের মারাত্মক রোগীদের লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

২) কানীপুকুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ

ডাক্তার ৫ জন (১ জন আয়ুর্বেদ, ১ জন হোমিও), নার্স ৫ জন।

বেড ২০টি।

বিছানা নেই, চাদর নেই, এক্স-রে, অক্সিজেন নেই। ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না।

৩) কৃষ্ণপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ

ডাক্তার ৫ (পরে ৩ জন পাঠানো হয়েছে), নার্স ৪/৫ জন।

বেড ২০টি (৫০-৬০টি রোগী প্রতিদিন ভর্তি থাকত। পরে ৩০জনকে লালবাগ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়)।

বিছানা নেই, চাদর নেই, এক্স-রে, অক্সিজেন নেই। ওষুধ পাওয়া যায় না।

এছাড়া দ্বিতীয় দফায় স্থানীয় শেখপাড়া, রামনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও ইসলামপুর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আক্রান্ত রোগীরা ভর্তি হয়েছে।

৪) লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে রোগী পাঠানো হয়েছে। ৩০-৪০ জন মারা গেছেন।

কাউকে কাউকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। লালবাগ হাসপাতালের ৫ জন চিকিৎসককে কর্তব্যে অবহেলার জন্য সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ও ২ নং ব্লক ঃ

৫) জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল ঃ

ডাক্তার ১০-১২ জন, নার্স ১৮ জন।

বেড ৫০টি। শিশুর জন্য ২০টি বেড। কিন্তু রোগী ছিল ১৫০-এর মতো। প্রায় ৪০ জন মারা গেছে।

এই মহকুমা হাসপাতালেও এক্স-রে, অক্সিজেন নেই, নেই অ্যান্টিবায়োটিক। এই হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কোন স্থায়ী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নেই।

৬) মালডোবা ব্লক হেল্থ সেন্টার ঃ

কোনও রোগী ভর্তি হয় না। সপ্তাহে ৩ দিন আউটডোর চলে। ঐদিন ডাক্তার আসেন। নার্স ১ জন সর্বক্ষণ থাকেন (শ্রীমতী লক্ষ্মী মাল)।

৭) তেঘরি ব্লক হেল্থ সেন্টার ঃ

সি এম ও এইচ-এর নির্দেশে চিকিৎসক ডাঃ অসিত দেওয়ান মুখ খুললেন না।

২জন ডাক্তার, ৩ জন নার্স, ১০টি বেড।

৮) সুতি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ

১০-১৫ জন ভর্তি ছিল।

এইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে মারাত্মক অসুস্থ রোগীদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের মন্তব্য

আধুনিক প্রযুক্তিতে সুনির্দিষ্ট ভাইরাল ইমিউনাইজেশন ও বিজ্ঞানের অবদান যা কাজে সীমিত হলেও ব্যবহার করা উচিত। ভাইরাল ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' এখনও গোটা দেশব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী মহামারীতে পরিণত হয়নি। তাই এই রোগে দ্রুত ব্যবস্থা নিলে এতগুলি শিশুমৃত্যু হওয়ার কথা নয়। তার জন্য প্রয়োজন বি পি এইচ সি এবং সাবডিভিশনাল হাসপাতালের আধুনিকীকরণ। বিশ্বব্যাঙ্কের লোন নিয়ে টাকা নয়ছয় হচ্ছে, কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঢেলে সাজানো হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান নিচুস্তরে ৫০ শতাংশ আদপে কার্যকরী হবে তো ? অতিজ্বর, শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি ইত্যাদি উপসর্গের চিকিৎসা আছে, প্রয়োজন রয়েছে দ্রুত চিকিৎসার এবং অবশ্যই তা উপযুক্ত হাসপাতালে। সময়মতো চিকিৎসা হলে মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যেত।

অপুষ্টি দূর করা, না, হোমিওপ্যাথি — কোন্টা জরুরি তা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলতে পারেন। জনগণের দাবি হল — বি সি রায় শিশু হাসপাতাল ও মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক শিশুমৃত্যুর মতো ঘটনা ভবিষ্যতে যেন আর না হয়। "হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি" দীর্ঘদিন ধরে ঘুণ ধরা স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা পশ্চিমবাংলা জুড়ে এই আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে চাই যাতে অসহায় শিশুরা অকালে ঝরে না পড়ে এবং পাশাপাশি স্বাস্থ্য প্রশাসনের টনক নড়ে। এইজন্যই সময়োপযোগী বেসরকারি এই তদন্ত।

সরকার কতটা দায়িত্বশীল

একের পাতার পর

সেই সরকারের স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষানীতি বিচার করলে বোঝা যায়। এ প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই নিষ্ঠুর অবহেলা দেখাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বাজেট নিতান্ত নগণ্য। স্বাস্থ্যখাতেও বরাদ্দ তারা ক্রমাগত কমাচ্ছে, স্বাস্থ্যব্যবস্থা বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে। এ রাজ্যেও তাই হচ্ছে, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য বাজেট ক্রমাগত কমাচ্ছে বেসরকারীকরণ করছে, হাসপাতালের চার্জ বাড়াচ্ছে। গরিব মানুষের চিকিৎসার সুযোগ কমে যাচ্ছে। বি সি রায় হাসপাতাল, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদে যা ঘটল, তার জন্য সরকারের নিষ্ঠুর অবহেলাই দায়ী। ঘটনার পর মন্ত্রীরা ফটোগ্রাফার নিয়ে ছুটে যান, বিবৃতি দেন, কিন্তু অবস্থা বদলায়না। এবারও সরকার ডাক্তারদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করছে, আপনাদের এই অভিযোগ সত্য। আধুনিক যুগে কী করে মাসাধিক কাল একটা রোগ অজানাই থেকে যায়? বাইরে থেকে দ্রুত বিশেষজ্ঞদের এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা কেন করা হল না? মন্ত্রীদের, এমনকি তাদের ছেলেমেয়েদের যেখানে দামী নার্সিং হোমে, এমনকি বিদেশের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গরিবদের জন্য এইটুকু ব্যবস্থা করা কি যেত না?

এ প্রসঙ্গে মেডিকেল শিক্ষায় ব্যাপক ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তা করে তিনি উপস্থিত চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে, আপনাদের শিক্ষকরাও তাই। এরপর সরকার যে বিপুলহারে ফি বাড়াচ্ছে, তাতে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়েরা আর মেডিকেল শিক্ষায় আসতে পারবে না। তিনি বলেন, চিকিৎসকরা যে দাবি তুলেছেন, আমাদের দল এস ইউ সি আই সেই দাবি নিয়ে আন্দোলনের মধ্যেই আছে, এই দাবিতে বাংলা বন্ধ হয়েছে, কিছুটা হলেও হাসপাতালের চার্জ কমানো গিয়েছে।

আই এম এ'র আন্দোলনের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আন্দোলনের মধ্যে মূল্যবোধ না থাকলে নীতি নৈতিকতা না থাকলে, আন্দোলন জয়যুক্ত হয় না। রোগীরা অসহায় অবস্থায় ডাক্তারদের কাছে স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে আসে, তারা রোগের প্রতিকার চায়, সহানুভূতি চায়। ডাক্তারদের এ দিকটা ভাবতে হবে, রোগীদের সহানুভূতির সাথে দেখতে হবে, চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু আপনাদের একাংশ এই নৈতিকতা নিয়ে চলছেন না। এদের মধ্যে নৈতিকতা আনতে হবে, তবেই আপনারা জনসমর্থন পাবেন।

জেনেভায় আই এল ও'র ৯১তম সম্মেলনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

গত ৩-১৯ জুন জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় আই এল ও'র ৯১তম অধিবেশন। এই অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহাকে মনোনীত করেছিল। তিনি ঐ অধিবেশনে 'শ্রমমান প্রয়োগ সংক্রান্ত' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের আলোচনায় যোগ দেন। এবং দেশে দেশে আই এল ও'র নির্ধারিত শ্রমমান লঙ্ঘন ও শ্রমিকদের অধিকারের উপর আক্রমণ বিষয়ে তিনি সমাপ্তি অধিবেশনে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

কমরেড সাহা বলেন, প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রেরই আই এল ও'র সিদ্ধান্ত (convention) মেনে চলার সমান নৈতিক দায় রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন সদস্য রাষ্ট্র আই এল ও'র সিদ্ধান্তগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে কী না, তা বিচার্য হতে পারে না। ফলে, স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলি লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগগুলি পর্যালোচনার সময়, তার পাশাপাশি বিশ্বের বহু দেশে শ্রমিকদের অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার যেসব অভিযোগ এসেছে, সেগুলির দিকেও কমিটিকে অবশ্য নজর দিতে হবে এবং সেখানে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির প্রশ্ন যুক্ত করা ঠিক নয়।

স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির বিষয়টা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে তার কারণ আই এল ও'র সিদ্ধান্তকে সরকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি এই অজুহাতে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশগুলিতেই বহু সরকারই তাদের দেশে শ্রমমান ও শ্রমিক অধিকারের উপর যথেচ্ছ আক্রমণ চালিয়ে গিয়েও আই এল ও'র নজরদারির বাইরে থেকে যাচ্ছে। শ্রমমান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এমন একটা চিত্র দেওয়া হয়, যাতে মনে হয় যেন কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই এটা ঘটছে। অথচ ঘটনা হল, আর্থিক ও সামরিক দিক দিয়ে সুপার পাওয়ার যে আমেরিকা, সেই দেশও আই এল ও'র ১৮৪টি সিদ্ধান্তের মধ্যে মাত্র ১২টিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। এবং মূল সিদ্ধান্তগুলি — যেমন সংগঠিত হওয়ার অধিকার, মালিক-কর্তৃপক্ষের সাথে শ্রমিকদের দরকষাকষি করার অধিকার, বাধ্যতামূলক শ্রম না করার অধিকার অথবা চাকরির ও জীবিকার ক্ষেত্রে বৈষম্য না করার রীতি ইত্যাদি কোনটিরই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি তারা দেয়নি। এর ফলে ৮০ শতাংশ মার্কিন শ্রমিক সংগঠিত হওয়ার ও দরকষাকষি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

নিউ ইয়র্ক থেকে যোগ দেওয়া একজন শ্রমিক প্রতিনিধির বক্তব্য উদ্ধৃত করে কমরেড সাহা বলেন, ওখানে ইউনিয়ন করলে শ্রমিকদের হুমকি দেওয়া ও ছাঁটাই করা হচ্ছে। জেলখানায় কর্মরত শ্রমিকদের বাজারদরের এক পঞ্চ মাংশ বেতন দিয়ে জোর করে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নিজেদের দেশে মৌলিক মানবাধিকারগুলি কেড়ে নিচ্ছে, আর বিশ্বের জনগণকে গণতন্ত্র, শ্রমমান ইত্যাদি নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছে। এর চেয়ে ভণ্ডামি আর কী হতে পারে? সুতরাং এই মুহূর্তের জরুরি কর্তব্য হল, দেশে দেশে শ্রমমান লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করে সে সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করে তা আই এল ও'র পরবর্তী সম্মেলনে পর্যালোচনার জন্য পেশ করা।

বিশ্বের দেশে দেশে দারিদ্র্যের তীব্রতা বিষয়ে একটি দলিল তৈরির জন্য তিনি ডিরেক্টর জেনারেলকে অভিনন্দন জানান। ঐ দলিলে তিনি দেখিয়েছেন দারিদ্র্য, বেকারি, বৈষম্য আজ সর্বব্যাপক রূপ নিয়েছে নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়নের ফলেই। এই প্রসঙ্গেই কমরেড সাহা বলেন, দারিদ্র্যের জাল থেকে মানুষের মুক্তির প্রশ্নটি প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে একটা নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সাথে যুক্ত—যে ব্যবস্থা শ্রমিকদের অধিকার, তার জীবন-জীবিকার রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করবে, যে ব্যবস্থা শ্রমজীবী জনগণকে প্রাপ্য মর্যাদা দেবে।

আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করল বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতি

১৯ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, সি-ই-এস-সি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ইউনিট প্রতি যথাক্রমে ২৫ পয়সা ও ৫২ পয়সা বৃদ্ধি, সিকিউরিটি ডিপোজিট বৃদ্ধি এবং অভিন্ন মাশুলনীতি প্রত্যাহারের দাবিতে ২০ জুন থেকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তার দ্বিতীয় পর্যায়ে আগামী ১৯ জুলাই রাজ্যব্যাপী সন্ধ্যা ৭টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার না করে প্রতিবাদ জানানোর জন্য রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে আমরা আবেদন করছি।

তিনি বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। পরবর্তী পর্যায়ে জেলায় জেলায় আইন অমান্য এবং ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্য ধর্মঘট ডাকা হবে।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই ১৯৯৮ সালের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৯নং ধারা প্রয়োগ করে এই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে পারতো। কলকাতা হাইকোর্ট অভিন্ন মাশুল প্রয়োগে যে স্থগিতাদেশ দিয়েছে কমিশন তাকে গুরুত্ব না দিয়ে পুনরায় চালু করেছে, কিন্তু অনুরোধ করা সত্ত্বেও সরকার হাইকোর্টে বিষয়টি জানাতে রাজি হয়নি। উপরন্তু অভিন্ন মাশুল চালু করার পক্ষে কেন্দ্রীয় আইনের আগেই বিল পাশ করিয়েছে। এই সবই প্রমাণ করছে যে, রাজ্য সরকারের পূর্ণ মদত রয়েছে কমিশনের কাজের পিছনে। তাই বিল বয়কট আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ ও সিটু কর্মীরা আক্রমণ চালিয়েছে। আক্রমণে ৫১ জন আহত ও ৪৭ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আন্দোলনকে ভাঙবার জন্য বিদ্যুৎমন্ত্রী ও শাসকদলের নেতারা একদিকে হুমকি অন্যদিকে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। এই হুমকি ও আক্রমণকে উপেক্ষা করে বিল বয়কট চলছে এবং ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে বলে তিনি জানান।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইনের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের 'আন্দোলনের কর্মসূচী' প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনকে ভাঙবার কৌশল ছাড়া কিছুই নয়। কারণ বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন চালু হওয়ার আগেই এর বেশিরভাগ অংশ রাজ্যে কার্যকরী করেছে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় বিল পেশ হয়েছে ২০০১ সালে। চালু হয়েছে ২০০৩ সালের জুনে। এই দীর্ঘকাল বামফ্রন্ট আন্দোলনের কোন কর্মসূচী নেয়নি। বিধানসভা থেকে একটা প্রস্তাবও গ্রহণ করেনি, এমনকি একটা বিকল্প বিদ্যুৎ আইনের খসড়াও পেশ করেনি। আইনটি পাশ হয়ে যাবার পর আন্দোলনের কথা বলছে। এসব লোক ঠকানোর কৌশল ছাড়া কিছু নয়। জনগণ এই ধূর্ততায় আর বিভ্রান্ত হবেন না।

ছাঁটাই, লকআউট, কালাচুক্তির প্রতিবাদে, চাকরি ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র ডাকে

২৫ জুলাই

সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীদের

অবস্থান ও বিক্ষোভ

রানি রাসমনি রোড, বেলা ১ - ৬টা

১৯ জুলাই সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা বিদ্যুতের আলো বর্জন করুন

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net